সংবাদ

তারিখ 0 8 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

সবাই যা দেখে

দেশে জঙ্গি উত্থানে শিক্ষাব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী

আবদুল মান্নান খান

জঙ্গি দমনে তাৎক্ষণিক কার্যক্রম যেমন প্রয়োজন তেমন এ দেশ থেকে চিরতরে জঙ্গি নির্মূল করতে প্রয়োজন স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনাও। আমার বক্তব্যটি হবে দীর্ঘ মেয়াদে সমাধানের পক্ষে। যেমন স্কুলপর্যায়ে সব শ্রেণীর শিক্ষার কারিকুলাম একেবারে ঢেলে সাজিয়ে ফেলতে হবে যাকে বলে একেবারে খলনলচে সমেত পাল্টে ফেলতে হবে। সব শিশু-কিশোরের লেখাপড়ার জন্য অভিন্ন কারিকুলাম তৈরি করে দিতে হবে। যে কোন শিক্ষার্থী প্রাইমারি পর্যায়ের যে কোন প্রতিষ্ঠানে যে শ্রেণীতে যেখানেই লেখাপড়া করুক না কেন তাকে ওই কারিকুলামের ভেতরে থেকেই লেখাপড়া করতে হবে সেটা ৫ম হোক আর ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হোক।

আমরা জানি এ কাজ করার সুযোগ একবার এসেছিল স্বাধীনতা উত্তরকালে। বঙ্গবন্ধু শুরুও করেছিলেন। দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তিনি জাতীয়করণ করে নিয়েছিলেন দেশ স্বাধীনের পরপরই। তখন দেশের অর্থনীতিসহ সার্বিক অবস্থার মধ্যে এমন যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুধু বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব ছিল। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ফলে সবকিছু ওলটপালট না হয়ে গেলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এতদিনে অবশ্যই আমরা দেখতে পেতাম দেশের প্রাথমিক শিক্ষা একটা অভিন্ন কারিকুলামের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। একই ধারায় চলছে দেশের সব প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লেখাপড়া। একই ধারার মন-মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠছে দেশের সব শিশু-কিশোর এবং তারা প্রথমেই শিখছে আমরা বাঙালি– পদ্মা মেঘনা যমুনা আমাদের ঠিকানা। কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিহতের পরে সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। দেখা গেল সেদিকে তো কেউ গেলই না বরং মাদরাসা শিক্ষা আরও জোরদার হয়ে উঠতে লাগল দেশে। সত্তর দশকের শেষদিকে এবং আশির দশকের মাঝামাঝি সময়টাতে চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গ্রামের প্রাইমারি স্কুল দেখতে গেলে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়েছে যখন দেখেছি জরাজীর্ণ স্কুলঘরটার দিকে কেউ খেয়াল করছে না অথচ মাদরাসা-মসজিদ দৃষ্টি নন্দন হয়ে উঠছে পাশেই।

এ কলামে একবার 'অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে, শিরোনামে এক লেখায় এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলেছিলাম। দেখিয়েছিলাম, কীভাবে শিক্ষার এক প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করা শিশুরা মনমানসিকতা ও আচার-আচরণে আরেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিশুদের থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। তারা মিলেমিশে চলতে পারছে না। একসঙ্গে খেলতে পারছে না। একটা সীমারেখা যেন সৃষ্টি করে চলেছে শিশুকালেই। উদাহরণ হিসেবে আমার নিজের গ্রামের একটা চিত্র তুলে ধরেছিলাম। আমাদের গ্রামটা বেশ বড়। উচ্চ শিক্ষিত তেমন পদস্থ লোকের সংখ্যা কম হলেও অনেক আগে থেকেই শিক্ষার হার সন্তোষজনক। গ্রামে হাইস্কুল গার্লস হাইস্কুলসহ কলেজও আছে সেটা এখানে বিষয় নয়। যেটা বিষয়– গ্রামে একটা ভালোমানের সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে। আছে একটা করে এবতেদায়ি নূরানি কওমি আবাসিক মাদরাসাসহ দুটো কিন্ডারগার্টেন স্কুল। লাগোয়া গ্রামগুলোতেও রয়েছে আবাসিক মাদরাসা-স্কুল। এতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের কোন শিশু সরকারি স্কুলে পড়ছে, কোন শিশু এবতেদায়ি মাদরাসায় পড়ছে, কোন শিশু হাফেজি-নূরানি মাদরাসায় পড়ছে, কোন শিশু কওমি মাদরাসায় পড়ছে, কেউবা কিনডারগার্টেন স্কুলে পড়ছে, এই ছয় রকম পড়ার সঙ্গে তারা ছয় রকমের মন-মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠছে গ্রামেই। শহরে আসুন, দেখবেন সেগুলো আরও বড় কলেবরে বিদ্যমান। তার সঙ্গে রয়েছে ইংরেজি ভার্সন এবং ইংরেজি মিডিয়াম।

গ্রামটির অধিকাংশ লোক নিম্নমধ্যবিত্ত। দেখা যায় তাদের অনেকেরই মাদরাসার প্রতি আগ্রহ বেশি। অনেকে তাদের সন্তানদের শুধু মাদরাসায় পড়তে পাঠান না সেখানে থাকার ব্যবস্থাও করে দেন ভোর রাতে উঠে হাফেজি পড়ার সুবিধার্থে। একটু অসচ্ছল অনেক অভিভাবক মনে করেন, তার ছেলেকে ওখানে পড়তে দিলে লেখাপড়াও হবে ধর্মশিক্ষা তথা আখেরাতের কাজও হবে। আবার থাকা-খাওয়ার খরচও দেয়া লাগল না– সেই তো ভালো। ওদের থাকা-খাওয়া নিয়ে এখানে একটু বলতে হয়। বলতে গেলে শুধু থাকা-খাওয়াই না ওই প্রতিষ্ঠানের খরচ ওরা নিজেরাই জোগাড় করে ফেলে মাদরাসার নামে চাঁদা তোলে। গ্রামের সব গৃহস্থবাড়ির সব প্রকারের ফসলের ভাগীদার ওরা। ওরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বস্তা কাঁধে বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিন। ওদের ভাষায় 'কালেকশনে' বেরিয়ে পড়ে। কৃষক তথা গৃহস্থের ঘরে ফসল ওঠার আগেই উঠান থেকে এমন কি মাঠ থেকে ওরা ওদের একটা অংশ দাবি করে নিয়ে নেয়। ধান-চাল কলাই-মসুর আম-কাঁঠাল বাঁশ-কাঠ নারিকেল-সুপারি কিছুই ওরা ছাড়ে না নিতে। ওরা মানুষকে পরকালের ভয় দেখায়। ভয় দেখায় 'গোর আজাবের'। শোনায় জান্নাতের আরাম-আয়েশের কথা। শোনায় ধর্মের পথে শহীদ হয়ে গেলে শহীদের দরজা পার হলেই অনন্তকালের জন্য পাওয়া যাবে অনন্তযৌবনা সব হুর-পরী। আবার সচ্ছল-অসচ্ছল নির্বিশেষে অনেকে মনে করেন হাফেজি পড়াই শ্রেষ্ঠ পড়া, পরিবারে একজন কোরআনে হাফেজ থাকলে ওই পরিবারের কেউ দোজখবাসী হবেন না। আখেরাতে সবারই বেহেস্ত নসিব হবে– দুর্জন বদখত পরিবারে যাই থাক। বলতেই হয় এসব কাজ যাকে বলে মগজ ধোলাইয়ের কাজ তারা এত দক্ষতার সঙ্গে এত নিপুণভাবে করতে পেরেছে যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আট-দশ বছর বয়সের প্রাইমারি স্কুলে পড়া মেয়েদের থেকে শুরু করে সত্তর-আশি বছর বয়সের বৃদ্ধারা হিজাব-বোরকায় একেবারে আপাদমস্তক মুড়িয়ে ফেলেছে নিজেদের। পাশের বাড়ির মেয়েদের রাস্তায় দেখলে চেনা যায় না যদি সে নিজের থেকে কথা না বলে। মুখে দাড়ি নেই এমন মানুষ দেখলেই তারা 'হেদায়েত' করতে শুরু করে। পাঠক, এ শুধু আমার গ্রামের কথা বলে মনে করার কোন কারণ নেই, খোঁজ নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের চিত্র প্রায় এ রকমই।

তাহলে এখন একথা বলাই যায়, ছয় রকম প্রাইমারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছয় রকম মনমানসিকতা নিয়ে ওরা যখন বড় হবে তখন তো নিজেরাই মারামারি করে মরবে এখন যেমন শুরু হয়েছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারবে না। বিশ্বাস করতে পারবে না। কারণ মানুষকে ভালোবাসার অনুভূতি নিয়ে বেড়ে ওঠার মতো কোন শিক্ষা যদি কেউ না পায় ধর্মবর্ণ যাই বলা হোক 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ উপলব্ধি যদি তাদের মধ্যে না আসে তা হলে এরকম জঙ্গি সৃষ্টি হবে তাতে বিচিত্র কি। এতদিন ধারণা করা হতো মক্তব-মাদরাসায় পড়া দরিদ্র পরিবারের সন্তানদেরই কিছু মানুষ টাকা-পয়সা দিয়ে মোটিভেটেড করে জঙ্গি কাজে নামাচ্ছে। কিন্তু এবারের গুলশান-শোলাকিয়ার জঙ্গি কাণ্ড সে ধারণা পাল্টে দিয়েছে। বিত্তবান ঘরের শিক্ষিত তরুণরা একাজে লিপ্ত হয়েছে। এর মানে কী! আসলে কি তারা শিক্ষিত, মোটেই তা নয়। তারা মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা পায়নি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এ শিক্ষা তারা পায়নি। হয়তো পেয়েছে মানুষের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেয়ার মতো শিক্ষা যা তাদের অমানুষ করে দিয়েছে। শিক্ষাটা তো আসতে হবে গোড়া থেকে অর্থাৎ সেই প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় থেকে। পরিবার থেকে।

সে যাই হোক, জঙ্গি কর্মকাণ্ডের পেছনে যখন শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমি বহুলাংশে দায়ী একথা বলতে চাইছি তখন একটু অতীতের দিকে তাকাতে হবে। সেকালে ব্রিটিশরা এক সময় ভাবল নেটিভদের একটু লেখাপড়া শিখিয়ে নিতে পারলে লাভ হবে। তারা শাসন-শোষণ করতে এসেছে লেখালেখি হিসাব-নিকাশের কাজ তারা করতে যাবে কোন দুঃখে। এ কাজ এদের দিয়েই করাতে হবে। সেই একটু লেখাপড়া শিখিয়ে নেয়ার কাজটা করতে গিয়ে এ ভূ-ভারত দখল করে প্রায় ২০০ বছর শাসন-শোষণের চেয়েও বড় ক্ষতির কাজটা তারা তখনই করে ফেলে। তারা হিন্দু-মুসলমান বিষয়টা সামনে নিয়ে আসে। মুসলমানদের লেখাপড়া করার জন্য মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে দেয়। মুসলমানরা সেখানে আরবি-ফারসি-উর্দু শিখবে, ধর্মকর্ম শিখবে ইত্যাদি। হিন্দুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো সংস্কৃত কলেজ হিন্দু কলেজ আরও কত কি। পাঠশালার শিক্ষায়ও আসল কত পরিবর্তন। শুরু হলো হিন্দু বা অন্য ধর্মের লোকদের থেকে মুসলমানদের শিক্ষা আলাদাভাবে গ্রহণের এবং সেটা মাদরাসায়। এতে করে মুসলমানরা ধর্মজ্ঞান আয়ত্ত করতে লাগলেন আর হিন্দুরা ইংরেজি শিখে রাজকার্যে ব্রিটিশদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সমস্যার শুরুটা হলো এখানেই। ভারতবাসীর বহু ভাষা-ধর্ম-বর্ণের কথা মাথায় রেখে ব্রিটিশরা যদি তাদের সুবিধা ষোলোআনা বজায় রেখে হলেও একটা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করত তা হলে হয়তো আজকের এ অবস্থা হতো না। তারা তা করেনি। তারপর পাকিস্তান আমলে তো সেই মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী পারলে বাংলা ভাষায় কথা বলাই বন্ধ করে দেয় এমন অবস্থা হয়েছিল।

তাই অবস্থাদৃষ্টে এ কথা বলাই যায়, দেশের জঙ্গি মনোভাবাপন্ন একটা শ্রেণী-গোষ্ঠী মনেপ্রাণে এখনও মেনে নিতে পারেনি যে, তারা বাঙালি, বাংলা তাদের মাতৃভাষা। পদ্মা মেঘনা যমুনা তাদেরও ঠিকানা– এটা তারা মানতে পারেনি। রবীন্দ্র নজরুল লালন জীবনানন্দকে তারা উপলব্ধি বা ধারণ করতে পারা তো দূরের কথা তাদের সৃষ্টিকেই তারা মানতে পারেনি। কেন পারেনি। সে দায় কার। আসলে সে শিক্ষা তাদের দেয়া হয়নি যেটা শুরুতে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। সবার জন্য শিক্ষাকে সেই ছাঁচে ফেলা হয়নি যে কথা আগে বলেছি।

কথায় কথা আসে। এখানে আরও দুটো বড় বিষয় রয়েছে। ১. আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা রক্ষায় আমরা জীবন দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ করে এক সাগর রক্ত ঝরিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। ২. আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। পবিত্র কোরআন শরিফ আমাদের ধর্মগ্রন্থ। এই দুটো বিষয় কি আমাদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছে? মোটেই তা পারেনি।

কথাটা একটু খোলসা করা যাক। আগে ধর্মের কথায় আসি। আমাদের ধর্মে প্রতিদিন পাঁচ বার নামাজ পড়ার বিধান আছে। সপ্তাহে একদিন প্রতি শুক্রবারে মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার নির্দেশ আছে। বছরে এক মাস রমজানে রোজা করার নির্দেশ আছে। রোজার শেষে ঈদুল ফিতর আমাদের প্রধান উৎসব। তারপরে আসে ঈদুল আজহা দ্বিতীয় প্রধান উৎসব। এ উৎসবে আমরা পশু কোরবানি দিই। কোরবানির মাংসের একটা অংশ গরিবদের মাঝে দান করে দেই। মহাধুমধামে আমরা উভয় ঈদ উৎসব পালন করি। নতুন জামাকাপড় পরি। ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়ি। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করি। পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্য বিনিময় করি। মহরমের দিন কারবালা ট্র্যাজেডি স্মরণ করে আমরা শোকে কাতর হই। শবেবরাতের দিন আমরা সামর্থ্য মতো ভালো খাবার খাই। হালুয়া-রুটি বিলাই। বিশেষ নামাজসহ এবাদত বন্দেগি করি।

পবিত্র কোরআন শরিফের ভাষা আরবি। নামাজের ভাষা আরবি। আরব দেশের ভাষা আরবি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা নামাজ পড়েন আরবি ভাষায়। আমরা বাঙালিরা সুরা কালাম আয়াত নিয়ত মুখস্থ করে নামাজ-রোজা করি। আরবি আমাদের ভাষা নয়। পবিত্র কোরআন শরিফ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। সহজলভ্য হয়েছে। আমরা তা পড়ছি। ধর্মের প্রতি আমাদের অনুরাগ অপরিসীম। কিছু না বুঝেও আমরা মনোযোগ সহকারে মসজিদে বসে খুতবা শুনি। রাত জেগে আলেম-ওলামাদের বয়ান শুনি ধর্মসভায়। ধর্ম নিয়ে কেউ কটাক্ষ করে কোন মন্তব্য করলে আমরা তা সহ্য করি না। সামর্থ্য থাকলে আমরা পবিত্র হজব্রত পালন করি। নবীজীর রওজায় পৌঁছে গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কাঁদি। আমরা ধনসম্পদের জাকাত দেই। আমরা দাড়ি রেখে টুপি পরে নবীর সুন্নাত পালন করি। আমরা বাসায় মৌলভী রেখে ছেলেমেয়েদের কোরআন শরিফ পড়া শেখাই। ধর্মের এসব রীতিনীতি আমরা মেনে চলি। ধর্মের বাহ্যত এসব রীতিনীতি পালন ছাড়াও ধর্মকর্মে প্রগাঢ়ভাবে নিবেদিতপ্রাণ মানুষের সংখ্যা কম নয়। যাদের আমরা পীর-দরবেশ আলেম-ওলামা ইসলামী চিন্তাবিদ ইত্যাদি বলে অভিহিত করে থাকি।

অন্যদিকে আগেই বলেছি আমরা বাঙালি। আমরা বাংলায় কথা বলি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষাকে রক্ষা করতে আমরা জীবন দিয়েছি। বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী একটি ভাষা আমাদের এই বাংলাভাষা। প্রায় ৪০ কোটি মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। বৈশাখী উৎসব আপামর বাঙালির উৎসব। প্রাণের উৎসব। আমরা ঘটা করে পালন করি। হালখাতা খুলি। সাজি নানা সাজে। গাই ঐতিহ্যের গান। বাংলা বছর শেষে চৈত্রসংক্রান্তির দিন মেলা বসে। বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় সে মেলার আনন্দ। কার্তিকে আমরা নবান্নের উৎসব পালন করি। পিঠাপুলি খাই। আমরা বাংলায় গান গাই। আমরা পলিমাটির দেশের নরম মনের মানুষ। বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত গ্রীষ্ম বসন্ত আমাদের ভেতরে কাজ করে ষড়ঋতুর প্রভাব ফেলে মনে। আমরা ঢাকের বাড়ি শুনে উদ্বেলিত হই। আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী পড়ি। দুর্গা পূজার সময় আমরা দলে দলে প্রতিমা দেখতে যাই। গান-বাজনার অনুষ্ঠানে গিয়ে ভিড় করি। এখন গ্রামবাংলার যেসব লোকজ অনুষ্ঠানাদি যেমন মেলা যাত্রা এখন কেন বিলুপ্ত হওয়ার পথে বলা যায় সেও যে এই জঙ্গি উত্থানের কারণে একথা কি অস্বীকার করা যাবে? বড়দিন আর বুদ্ধপূর্ণিমায় আমরা ছুটি ভোগ করি। আমরা হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে বসবাস করি। আমরা বাঙালি। আমরা মুসলমান। আমরা আরবীয় তুর্কী আফগান হয়ে যেতে পারি না তা ইসলাম ধর্ম আরব থেকে যেদিক দিয়ে যেভাবেই বাংলায় প্রবেশ করুক না কেন। আমাদের পরিচয় আমরা বাঙালি আমাদের ধর্ম ইসলাম– এটাই শেষ কথা। জঙ্গি তৎপরতার কোন স্থান এখানে হবে না।

যে কথাটা বলে শেষ করব তা হলো, দেশে প্রাথমিক শিক্ষা তা সে ৫ম বা ৮ম যে শ্রেণী পর্যন্তই হোক এবং আরবি উর্দু ফারসি ইংরেজি সংস্কৃতি উপজাতীয় ভাষা যা-ই যেখানে পড়ান হোক তার কোনটাকে অমর্যাদা করে নয় কোনটাকে ছোট করে দেখে নয় বরং সবগুলোকে সমন্বিত করে আত্মমর্যাদাশীল একটা অভিন্ন কারিকুলাম জাতিকে উপহার দিতে হবে। প্রয়োজনে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা এবং তার থেকে গ্রহণযোগ্য একটা উপায় বের করে আনা। কাজটা কঠিন ঠিকই কিন্তু অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে শিক্ষা দিয়েই পরাভূত করতে হবে জঙ্গি মানসিকতাকে।